#RiseWithRICE

RICE IAS

প্রত্যাশিত

MAINS TOPIC

DEEP ANALYSIS

for

IAS মেইনস পরীক্ষা

From

04th May to 09th May 2026

সূচক

1. সাধারণ অধ্যয়ন ২ 01

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা 01

1.1.1. ভারতে অনলাইন বাকস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ: গণতান্ত্রিক উদ্বেগ এবং আইনি টানাপোড়েন 01

1.1.2. বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬ 04

1.2. সামাজিক ন্যায়বিচার 06

1.2.1. ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য: প্রবণতা, মাত্রা এবং নীতিগত উদ্বেগ 06

2. সাধারণ অধ্যয়ন ৩ 10

2.1. অর্থনীতি 10

2.1.1. খণ্ডিত বিশ্বব্যবস্থায় ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা 10

2.2. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা 13

2.2.1. ভারতের নগর অগ্নি নিরাপত্তা: চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকার 13

2.3. প্রতিরক্ষা 16

2.3.1. ভারতের নতুন নিরাপত্তা নীতি 16

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

সাধারণ অধ্যয়ন ২

1.1. রাষ্ট্রনীতি ও শাসনব্যবস্থা

1.1.1. ভারতে অনলাইন বাকস্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ: গণতান্ত্রিক উদ্বেগ এবং আইনি টানাপোড়েন

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অনলাইন কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ কঠোর ও দৃঢ় হয়েছে। Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021-এর সংশোধন এবং Information Technology Act, 2000-এর বিভিন্ন ধারার ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র ডিজিটাল আলোচনার ওপর উল্লেখযোগ্য নিয়ন্ত্রণ লাভ করেছে।

যদিও এর ঘোষিত উদ্দেশ্য হলো **ভুল তথ্য** (Misinformation), অবৈধ কন্টেন্ট এবং **AI-নির্ভর কারসাজি** (Deepfakes)-র মতো উদীয়মান হুমকি মোকাবিলা করা, তবে এর প্রয়োগের ধরণ **বাকস্বাধীনতা** (Freedom of Speech), প্রাতিষ্ঠানিক দায়বদ্ধতা এবং গণতান্ত্রিক রীতিনীতি নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলেছে।

আইনি কাঠামো এবং এর বিবর্তন

অনলাইন কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণের আইনি ভিত্তি মূলত দুটি ধারার ওপর নির্ভরশীল:

- **Section 69A:** এটি সরকারকে সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং **জনশৃঙ্খলার** (Public Order) স্বার্থে জনগণের জন্য তথ্যের অ্যাক্সেস ব্লক করার ক্ষমতা দেয়।
- **Section 79(3)(b):** যদি মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো (Intermediaries) অবৈধ কন্টেন্ট সম্পর্কে জানার পর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তবে তাদের **"সেফ হারবার"** (Safe Harbour) সুরক্ষা কেড়ে নেওয়া হয়।

মূলত, এই বিধানগুলো একটি সংকীর্ণ এবং পদ্ধতিগতভাবে সুরক্ষিত কাঠামোর মধ্যে কাজ করার কথা ছিল। সুপ্রিম কোর্ট **শ্রেয়া সিংঘল বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া** (Shreya Singhal vs Union of India) মামলায় এটি স্পষ্ট করেছিল যে, মধ্যস্থতাকারীরা কেবলমাত্র তখনই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য যখন তারা পাবে:

১. একটি **আদালতের আদেশ**, অথবা

২. একটি আইনত বৈধ **সরকারি বিজ্ঞপ্তি**।

এই রায়টি যথেচ্ছ সেন্সরশিপ প্রতিরোধ এবং সংবিধানের Article 19(1)(a) রক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আইনের শাসন থেকে সরে গিয়ে **নির্বাহী বিভাগ-চালিত** (Executive-driven) প্রয়োগের দিকে ঝুঁকছে, যেখানে আদালতের নির্দেশিত সুরক্ষা কবচগুলো অনেক সময়ই অনুপস্থিত থাকছে।

উদীয়মান সমস্যার প্রকৃতি

১. **প্রতিক্রিয়ার সময় সংক্ষেপণ এবং বাধ্যতামূলক পরিপালন:** মেটা (Meta) এবং এক্স (X)-এর মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে চিহ্নিত কন্টেন্ট অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে (কখনও কখনও মাত্র **৩ ঘণ্টার মধ্যে**) সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে:

   - প্ল্যাটফর্মগুলো কন্টেন্টের বৈধতা যাচাই করার বাস্তবসম্মত সুযোগ পায় না।

- **সেফ হারবার** সুরক্ষা হারানো বা **ফৌজদারি দায়বদ্ধতার** (Criminal Liability) ভয়ে তারা অতিরিক্ত কন্টেন্ট সরিয়ে ফেলে (Over-compliance)। এটি মধ্যস্থতাকারীদের নিরপেক্ষ প্ল্যাটফর্মের বদলে রাষ্ট্রের সেন্সরশিপের এজেন্টে পরিণত করে।

২. **আইনসভার সমর্থন ছাড়াই নির্বাহী ক্ষমতার বিস্তার: 'সহযোগ পোর্টাল'** (Sahyog portal)-এর মতো ব্যবস্থাগুলো, যা দেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কন্টেন্ট সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ পাঠানোর অনুমতি দেয়, তা কার্যকরভাবে সেন্সরশিপের পরিকাঠামোকে বিস্তৃত করেছে। এর মূল সমস্যা হলো:

- এই ক্ষমতাগুলো সংসদের সুস্পষ্ট অনুমোদন ছাড়াই ব্যবহার করা হচ্ছে।
- এটি **ক্ষমতার পৃথকীকরণ** (Separation of Powers) নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে, যেখানে আইন প্রণয়ন কেবল আইনসভার এক্তিভুক্ত হওয়া উচিত।

৩. **অস্বচ্ছতা এবং স্বচ্ছতার অভাব:** সবচেয়ে গুরুতর গণতান্ত্রিক ঘাটতি হলো নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে প্রকাশ্য তথ্যের অভাব:

- কতগুলো কন্টেন্ট সরানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে।
- অপসারিত কন্টেন্টের ধরণ।
- কোন যুক্তিতে এগুলো সরানো হয়েছে। এই গোপনীয়তা তথ্যের ভারসাম্যহীনতা এবং জবাবদিহিতার অভাব তৈরি করে, যা বিচার বিভাগীয় বা জনসাধারণের নিরীক্ষাকে কঠিন করে তোলে।

৪. **বাকস্বাধীনতার ওপর নেতিবাচক প্রভাব** (Chilling Effect): এই পদক্ষেপগুলোর সম্মিলিত প্রভাবে একটি **"চিলিং ইফেক্ট"** তৈরি হচ্ছে, যেখানে ব্যক্তিরা ভয়ের কারণে তাদের সমালোচনামূলক মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকছে। তারা ভয় পায়:

- অ্যাকাউন্ট স্থগিত হওয়ার।
- আইনি পরিণতির।
- জীবিকা হারানোর (বিশেষ করে ডিজিটাল নির্মাতাদের ক্ষেত্রে)। এটি কেবল অবৈধ বক্তব্যকেই নয়, বরং বৈধ রাজনৈতিক ভিন্নমত, ব্যঙ্গ এবং **অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকেও** (Investigative Journalism) ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

৫. **প্রাতিষ্ঠানিক উদ্বেগ এবং বিচার বিভাগীয় প্রতিক্রিয়া:** উদ্বেগ বাড়ছে যে:

- নিম্ন আদালতগুলো অনেক সময় **শ্রেয়া সিংঘল** মামলার নজির কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।
- নির্বাহী বিভাগ গভীর পর্যালোচনা এবং বিতর্ক এড়াতে আনুষ্ঠানিক আইনের বদলে নিয়মনীতি ব্যবহার করছে। এর ফলে সাংবিধানিক সুরক্ষা তাত্ত্বিকভাবে থাকলেও বাস্তবে দুর্বল হয়ে পড়ছে।

রাজনৈতিক অপব্যবহারের ঝুঁকি

এই ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এটি কাঠামোগতভাবে রাজনৈতিকভাবে নিরপেক্ষ হলেও ব্যবহারিকভাবে অপব্যবহারযোগ্য। আজকের শাসক দল হয়তো এর মাধ্যমে জনমত নিয়ন্ত্রণ করে সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু আগামীকালের বিরোধী দল ক্ষমতায় এলে একই ব্যবস্থা ব্যবহার করতে পারে। তাই এটি কোনো বিশেষ দলের নয়, বরং একটি **পদ্ধতিগত সমস্যা** (Systemic Issue), যা দীর্ঘমেয়াদে গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার জন্য উদ্বেগের।

সরকারের যুক্তি: একটি প্রয়োজনীয় প্রতিপক্ষ

এটি স্বীকার করা গুরুত্বপূর্ণ যে রাষ্ট্রের উদ্বেগগুলো একেবারে ভিত্তিহীন নয়। বর্তমান ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্রে রয়েছে:

- ভুল তথ্য এবং **ডিপফেকের** (Deepfakes) দ্রুত বিস্তার।
- জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি।
- অনলাইন উগ্রবাদ এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা।

এই প্রেক্ষাপটে সরকার যুক্তি দেয় যে:

- কন্টেন্ট নিয়ন্ত্রণে **দ্রুততা** (Speed) অপরিহার্য।
- ঐতিহ্যগত আইনি প্রক্রিয়া ডিজিটাল ক্ষতি প্রতিরোধের জন্য অত্যন্ত ধীরগতির হতে পারে।

তবে মূল সমস্যাটি নিয়ন্ত্রণের অস্তিত্ব নিয়ে নয়, বরং এর **প্রয়োগের ধরন ও পরিধি** নিয়ে।

ভবিষ্যতের পথনির্দেশ

একটি ভারসাম্যপূর্ণ এবং সাংবিধানিকভাবে সুসংগত পদ্ধতির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো প্রয়োজন:

- **আইনসভার সমর্থন** (Legislative Backing): ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের ক্ষমতার যেকোনো প্রসারণ অবশ্যই **সংসদে** (Parliament) বিতর্কিত এবং অনুমোদিত হতে হবে, যা এর গণতান্ত্রিক বৈধতা নিশ্চিত করবে।
- **বিচার বিভাগীয় তদারকি শক্তিশালী করা** (Strengthening Judicial Oversight): কন্টেন্ট সরিয়ে নেওয়ার (Takedown) ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে:
  - **স্বতন্ত্র পর্যালোচনা** (Independent review)
  - **সময়সীমাবদ্ধ আপিল প্রক্রিয়া** (Time-bound appellate processes)
- **স্বচ্ছতা এবং প্রকাশ** (Transparency and Disclosure): নিয়মিতভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রকাশ করতে হবে:
  - কন্টেন্ট সরানোর পরিসংখ্যান।
  - আইনি ভিত্তি বা কারণ।
  - পরিপালন রিপোর্ট (Compliance reports)।
- **যথাযথ প্রক্রিয়ার সাথে প্ল্যাটফর্মের দায়বদ্ধতা:** মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত:
  - অন্ধভাবে সরকারি নির্দেশ পালন না করা।
  - দৃঢ় অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- **ডিজিটাল অধিকার কাঠামো** (Digital Rights Framework): ভারতের একটি ব্যাপক ভিত্তিক কাঠামোর প্রয়োজন যা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখবে:
  - নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ।
  - **মৌলিক অধিকার** (Fundamental rights)।
  - প্রযুক্তিগত বাস্তবতা।

উপসংহার

অনলাইন বাকস্বাধীনতার নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি, আইন এবং গণতন্ত্রের সংযোগস্থলে অবস্থিত। ডিজিটাল ক্ষতি মোকাবিলায় রাষ্ট্রের একটি বৈধ ভূমিকা থাকলেও, অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতার কেন্দ্রীভূতকরণ সেই **গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকেই** ক্ষুণ্ণ করার ঝুঁকি তৈরি করে যা রাষ্ট্র রক্ষা করতে চায়।

যদি এই প্রবণতাগুলো নিরসন না করা হয়, তবে ভারতের ডিজিটাল পাবলিক স্ফেয়ার ধীরে ধীরে একটি নিয়ন্ত্রিত এবং একঘেয়ে স্থানে পরিণত হতে পারে, যা **বহুত্ববাদ** (Pluralism) এবং ভিন্নমতকে ধ্বংস করবে। অতএব, চ্যালেঞ্জটি হলো এমন একটি কাঠামো তৈরি করা যা কার্যকর কিন্তু সংযত, শক্তিশালী কিন্তু দায়বদ্ধ এবং দৃঢ় কিন্তু সাংবিধানিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

Q. Regulation of online speech in India increasingly reflects a tension between security and liberty." Discuss. (10 Marks)

1.1.2. বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬

প্রেক্ষাপট

এলাহাবাদ হাইকোর্ট রায় দিয়েছে যে, ২০০৬ সালের **বন অধিকার আইন** আগের সমস্ত বিরোধী আদালতের নির্দেশকে বাতিল করার ক্ষমতা রাখে। আদালত **থারু উপজাতিদের** দাবি খারিজের সিদ্ধান্তকে বাতিল করেছে এবং বনবাসীদের অধিকার ক্ষুণ্নকারী বর্তমান প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় ত্রুটিগুলিকে চিহ্নিত করেছে।

বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬ সম্পর্কে

তফসিলি জনজাতি এবং অন্যান্য ঐতিহ্যগত বনবাসী (বন অধিকার স্বীকৃতি) আইন, ২০০৬-এর মূল লক্ষ্য হলো বনবাসী সম্প্রদায়ের ওপর যুগ যুগ ধরে চলা **"ঐতিহাসিক অন্যায়"** দূর করা।

বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬-এর উদ্দেশ্য

- বনবাসী **তফসিলি জনজাতি** এবং ঐতিহ্যগত বনবাসী সম্প্রদায়ের দ্বারা ভোগ করা **ঐতিহাসিক অন্যায়** সংশোধন করা।
- জমি এবং সম্পদের ওপর বনের অধিকার (ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত) **স্বীকৃতি** দেওয়া এবং তাদের হাতে অর্পণ করা।
- বনজ সম্পদ এবং জমির অধিকারের মাধ্যমে তাদের **জীবিকার সুরক্ষা** নিশ্চিত করা।
- জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে **টেকসই বন সংরক্ষণ** ত্বরান্বিত করা।
- **গ্রাম সভার** নেতৃত্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে **বিকেন্দ্রীভূত শাসন ব্যবস্থা** শক্তিশালী করা।
- বনবাসীদের অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ এবং **উদ্বাস্তু** হওয়া থেকে রক্ষা করা।
- **পরিবেশগত ভারসাম্য** এবং **সামাজিক ন্যায়বিচারের** মধ্যে সমতা রক্ষা করা।

বন অধিকার আইন (FRA), ২০০৬-এর মূল ধারাগুলি

১. **যোগ্যতার মাপকাঠি**

- **তফসিলি জনজাতি (FDST):** তাদের মূলত বনভূমিতে বসবাস করতে হবে এবং জীবিকার জন্য বনের ওপর নির্ভরশীল হতে হবে।
- **অন্যান্য ঐতিহ্যগত বনবাসী (OTFD):** তাদের ১৩ ডিসেম্বর, ২০০৫-এর আগে অন্তত **তিন প্রজন্ম (৭৫ বছর)** বনে বসবাস এবং তার ওপর নির্ভরশীল থাকার প্রমাণ দিতে হবে।

২. **স্বীকৃত অধিকারের ধরণ**

- **মালিকানা স্বত্ব (Title Rights):** আদিবাসী বা বনবাসীদের চাষ করা জমির মালিকানা (সর্বোচ্চ **৪ হেক্টর**)। কোনো নতুন জমি দেওয়া হয় না; কেবল বর্তমানে দখলে থাকা জমির স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- **ব্যবহারিক অধিকার (Use Rights): লঘু বনজ সম্পদ (MFP)** (যেমন- মধু, মোম, কেন্দু পাতা), গবাদি পশুর চারণভূমি এবং জলাশয় ব্যবহারের অধিকার।
- **বন ব্যবস্থাপনা অধিকার:** যেকোনো **গোষ্ঠীগত বন সম্পদ**, যা তারা ঐতিহ্যগতভাবে রক্ষা করে আসছে, তা রক্ষা এবং পুনরুৎপাদন করার অধিকার।

৩. **সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (প্রক্রিয়া)**

১. **গ্রাম সভা:** এটি হলো **প্রাথমিক কর্তৃপক্ষ**। এটি একটি প্রস্তাব পাসের মাধ্যমে সুপারিশ করে যে কার কার অধিকার স্বীকৃত হওয়া উচিত।

২. **মহকুমা স্তরের কমিটি (SDLC):** গ্রাম সভা কর্তৃক পাস করা প্রস্তাবগুলি পরীক্ষা করে দেখে।

৩. **জেলা স্তরের কমিটি (DLC):** এটি হলো **চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ** যা দাবিগুলি অনুমোদন বা খারিজ করার ক্ষমতা রাখে।

বন অধিকার আইন (FRA) ২০০৬-এর প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

- **উচ্চ প্রত্যাখ্যানের হার:** জেলা স্তরের কমিটি (DLC) প্রায়ই কারিগরি খুঁটিনাটি বা **"অপর্যাপ্ত প্রমাণের"** অজুহাতে দাবিগুলো খারিজ করে দেয়। এক্ষেত্রে আবেদনকারীদের আপিল করার কোনো সুযোগ দেওয়া হয় না।
- **প্রশাসনিক বাধা:** বন বিভাগ প্রায়ই আধুনিক বন অধিকার আইনের চেয়ে **ঔপনিবেশিক আমলের আইনগুলোকে** বেশি প্রাধান্য দেয়। তারা আদিবাসীদের অধিকার স্বীকার করাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভয় হিসেবে দেখে।
- **সম্মতির লঙ্ঘন:** বিভিন্ন উন্নয়নমূলক ও খনি প্রকল্পের জন্য বনভূমি ব্যবহারের সময় গ্রাম সভার বাধ্যতামূলক **"বাধাহীন এবং আগাম সম্মতি"** নেওয়া হয় না।
- **অন্যান্য ঐতিহ্যগত বনবাসীদের (OTFD) প্রমাণের বোঝা:** অ-আদিবাসীদের ক্ষেত্রে **"তিন প্রজন্ম" (৭৫ বছর)** বসবাসের প্রমাণ দেওয়া প্রায় অসম্ভব। এর ফলে বিপুল সংখ্যক বনবাসী তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হন।
- **প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা:** গ্রাম সভাগুলোর কাছে অনেক সময় **জিপিএস (GPS)**-এর মতো কারিগরি সরঞ্জাম বা আইনি দক্ষতা থাকে না, যার ফলে তারা সঠিকভাবে নিজেদের অধিকার দাবি বা রক্ষা করতে পারে না।
- **মানচিত্র ও সীমানা নিয়ে বিরোধ:** ডিজিটাল নথির অভাব এবং অস্পষ্ট সীমানার কারণে সাধারণ মানুষের জমি ও **"সংরক্ষিত বনাঞ্চলের"** মধ্যে প্রায়ই আইনি জটিলতা তৈরি হয়।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- **ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তির ব্যবহার:** গ্রাম সভাগুলোকে সীমানা নির্ধারণে সহায়তা করতে **উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন স্যাটেলাইট ইমেজ** এবং জিপিএস ম্যাপিং ব্যবহার করতে হবে, যাতে বন বিভাগের ওপর নির্ভরতা কমে।
- **গ্রাম সভাকে শক্তিশালী করা:** স্থানীয় সংস্থাগুলোকে আইনি ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজেদের অধিকার দাবি করতে পারে এবং তাদের **"সম্মতি প্রদানের ক্ষমতা"** প্রয়োগ করতে পারে।
- **আপিল প্রক্রিয়া সহজ করা:** একটি স্বচ্ছ এবং সময়োপযোগী ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে যাতে জেলা কমিটির (DLC) সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবেদনকারীরা কোনো **স্বাধীন ট্রাইব্যুনালের** কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।
- **আমলাতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো:** বন ও রাজস্ব কর্মকর্তাদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে তারা নিজেদের 'শাসক' মনে না করে আদিবাসী অধিকারের **'সহযোগকারী'** হিসেবে কাজ করেন।
- **সমন্বিত শাসন ব্যবস্থা:** বন অধিকারের সাথে অন্যান্য সরকারি প্রকল্প যেমন—**MGNREGA (১০০ দিনের কাজ)** এবং মিশন অন্ত্যোদয়কে যুক্ত করতে হবে, যাতে জমির অধিকারের পাশাপাশি বনবাসীদের জীবিকাও নিশ্চিত হয়।

উপসংহার

বন অধিকার আইন (FRA) হলো **সামাজিক ন্যায়বিচারের** একটি ঐতিহাসিক হাতিয়ার। এর সাফল্য নির্ভর করছে আদালতের রায়কে আইনের মূল উদ্দেশ্যের সাথে মেলানো, গ্রাম সভাকে শক্তিশালী করা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপর। তবেই কাগজের আইন ও মাঠপর্যায়ের বাস্তবায়নের মধ্যে ব্যবধান কমানো সম্ভব হবে।

Q. "Despite the progressive intent of the Forest Rights Act, 2006, its implementation remains fraught with legal and administrative challenges." Critically examine in the light of recent judicial developments. (15 Marks)

1.2. সামাজিক ন্যায়বিচার

1.2.1. ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য: প্রবণতা, মাত্রা এবং নীতিগত উদ্বেগ

প্রেক্ষাপট

সাম্প্রতিক কিছু নীতিগত পরিবর্তন, যেমন—নতুন **শ্রম বিধি** (Labour Codes) কার্যকর করা এবং **মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন** (MGNREGA)-এর পরিবর্তে **বিকশিত ভারত-গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ) বিল, ২০২৫** আনা হয়েছে। এই পরিবর্তনগুলো ভারতে **বৈষম্য**, **শ্রমিক কল্যাণ** এবং **গ্রামীণ সংকট** নিয়ে নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

বৈষম্য কী?

বৈষম্য বলতে অর্থনৈতিক সম্পদ (যেমন—আয়, সম্পদ) এবং জীবনধারণের সুযোগ-সুবিধার (যেমন—শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, রাজনৈতিক অধিকার) অসম বণ্টনকে বোঝায়। এটি কেবল "কারো কাছে কম থাকা" নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যে বিশাল **ব্যবধান** বা ফাঁক থাকে, তাকেই বোঝায়।

বৈষম্যের প্রধান ধরণসমূহ

১. **আয় বৈষম্য** (Income Inequality): ব্যক্তিদের মধ্যে বেতন এবং উপার্জনের অসম বণ্টন। এখানে উচ্চ-আয়ের গোষ্ঠীগুলি নিম্ন-আয়ের শ্রমিকদের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ উপার্জন করে।
   - **উদাহরণ:** একজন কর্পোরেট সিইও মাসে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করছেন, অথচ একজন দিনমজুর দিনে মাত্র কয়েকশ টাকা পান।

২. **সম্পদ বৈষম্য** (Wealth Inequality): জমি, বাড়ি, সোনা, শেয়ার এবং ব্যবসার মতো সম্পদের অসম মালিকানা। এর ফলে দেশের অধিকাংশ সম্পদ মাত্র কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত থাকে।
   - **উদাহরণ:** ভারতের অল্প শতাংশ মানুষের হাতে শহরের দামি বাড়ি এবং বিশাল আর্থিক সম্পদ রয়েছে, অন্যদিকে অনেক গ্রামীণ পরিবার আজও ভূমিহীন।

৩. **ভোগ বৈষম্য** (Consumption Inequality): শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় জিনিসের পেছনে ব্যয় করার ক্ষমতার পার্থক্য।
   - **উদাহরণ:** শহরের সচ্ছল পরিবারগুলো দামি বেসরকারি শিক্ষা এবং বিলাসিতার পেছনে প্রচুর খরচ করছে, কিন্তু গরিব পরিবারগুলো পুষ্টিকর খাবার জোগাড় করতেই হিমশিম খাচ্ছে।

৪. **সামাজিক বৈষম্য** (Social Inequality): জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম, শ্রেণি বা অঞ্চলের ভিত্তিতে সুযোগ এবং সম্পদের অসম ব্যবহার।
   - **উদাহরণ:** প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর তুলনায় নারী এবং তফশিলি জাতিভুক্ত মানুষরা প্রায়ই চাকরি, শিক্ষা এবং সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হন।

বৈষম্য পরিমাপের উপায়

১. **গিনি কোঅফিসিয়েন্ট (Gini Coefficient):** এটি একটি গাণিতিক পদ্ধতি যা সমাজের আয়, সম্পদ বা ভোগের বৈষম্য পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।

- **গিনি কোঅফিসিয়েন্ট = ০ → পূর্ণ সমতা** (যখন সবার আয় বা সম্পদ সমান হয়)।
- **গিনি কোঅফিসিয়েন্ট = ১ → পূর্ণ বৈষম্য** (যখন একজনের হাতেই সব সম্পদ বা আয় থাকে)।
- **উদাহরণ:** যদি দুটি পরিবারের আয় প্রায় সমান হয়, তবে বৈষম্য কম; কিন্তু যদি একটি পরিবার অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি আয় করে, তবে বৈষম্য বেশি।

২. **মাসিক মাথাপিছু ব্যয় বা MPCE (Monthly Per Capita Expenditure):** একটি পরিবারের প্রতি সদস্যের গড় মাসিক খরচের হিসেবকে MPCE বলা হয়। ভারতে ভোগের বৈষম্য বুঝতে এটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

- **সূত্র:** MPCE = পরিবারের মোট মাসিক খরচ ÷ পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা।
- **উদাহরণ:** যদি একটি পরিবারের মাসে ২০,০০০ টাকা খরচ হয় এবং পরিবারে ৫ জন সদস্য থাকে, তবে MPCE হবে ৪,০০০ টাকা।

ভারতে বৈষম্য সংক্রান্ত মূল ফলাফল

ওয়ার্ল্ড ইনইকুয়ালিটি ল্যাব (২০২৪) এবং **NSSO-এর গৃহস্থালি ভোগ ব্যয় সমীক্ষা (HCES ২০২৩-২৪)**-এর ওপর ভিত্তি করে আপনার নোটের জন্য ৫টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট নিচে দেওয়া হলো:

- **"বিলিয়নেয়ার রাজ"-এর উত্থান:** ২০০০-এর দশকের শুরু থেকে ভারতে বৈষম্য আকাশচুম্বী হয়েছে। ২০২২-২৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, জনসংখ্যার **শীর্ষ ১% মানুষের হাতে জাতীয় আয়ের ২২.৬% এবং মোট সম্পদের ৪০.১%** রয়েছে। এই পরিসংখ্যান ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের আমলের চেয়েও বেশি।
- **ভোগ বৈষম্য হ্রাস:** সম্পদের তুলনায় ভোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য (Gini Coefficient) কিছুটা কমেছে। ২০২৩-২৪ সালে এটি কমে **গ্রামীণ এলাকায় ০.২৩৭** এবং **শহরাঞ্চলে ০.২৮৪**-এ দাঁড়িয়েছে। এর অর্থ হলো, সম্পদ মুষ্টিমেয় মানুষের হাতে জমলেও সাধারণ মানুষের কেনাকাটা বা ভোগের ক্ষমতা আগের চেয়ে কিছুটা ছড়িয়েছে।
- **গ্রাম-শহরের ব্যবধান কমে আসা:** গ্রামীণ ও শহুরে ভারতের মধ্যে ভোগের ব্যবধান কমছে। মাসিক মাথাপিছু ব্যয় (MPCE)-এর পার্থক্য ২০১১-১২ সালের ৮৪% থেকে কমে ২০২৩-২৪ সালে **৭০%**-এ নেমে এসেছে। মূলত গ্রামীণ এলাকায় খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের পেছনে খরচ বাড়ার কারণে এটি সম্ভব হয়েছে।
- **ব্যয়ের ধরণে পরিবর্তন (খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের প্রাধান্য):** প্রথমবারের মতো গ্রামীণ গৃহস্থালির মোট খরচের অর্ধেকেরও কম (**৪৭%**) খাদ্যের পেছনে ব্যয় হচ্ছে। মানুষ এখন যাতায়াত, ইলেকট্রনিক্স পণ্য এবং প্রক্রিয়াজাত খাবারের পেছনে বেশি খরচ করছে, যা গ্রামীণ অর্থনীতির পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।
- **কল্যাণমূলক প্রকল্পের প্রভাব:** সরকারি প্রকল্পগুলোর (যেমন—PMGKY-এর অধীনে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য) ইতিবাচক প্রভাব সবথেকে গরিব স্তরের মানুষের ওপর পড়েছে। বিনামূল্যে পাওয়া সামগ্রীর মূল্য হিসেবে ধরলে দেখা যায়, সবথেকে দরিদ্র ৫-১০% মানুষের ভোগের হার সবথেকে দ্রুত বেড়েছে।

ভারতে ক্রমবর্ধমান বৈষম্যের কারণ

১. **দক্ষতা-ভিত্তিক প্রযুক্তিগত পরিবর্তন (SBTC):** দ্রুত ডিজিটালকরণ এবং AI-এর ব্যবহার উচ্চ-দক্ষ কর্মীদের বেতন বাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যদিকে, কম দক্ষ কর্মীরা অটোমেশনের কারণে কাজ হারানোর ঝুঁকিতে আছেন বা তাদের বেতন বাড়ছে না।

২. **অপ্রগতিশীল কর ব্যবস্থা ও ফাঁকফোকর:** পরোক্ষ কর (যেমন—GST) গরিবদের ওপর আয়ের অনুপাতে ধনীদের চেয়ে বেশি বোঝা তৈরি করে। এছাড়া অতি-ধনীদের অনেকেই আইনি ফাঁকফোকর ব্যবহার করে কম হারে কর দিয়ে থাকেন।

৩. **পুঁজির ঘনত্ব বনাম শ্রমের স্থবিরতা:** শেয়ার বাজার বা জমির মতো সম্পদ থেকে আসা আয় সাধারণ শ্রমিকের মজুরির তুলনায় অনেক দ্রুত বেড়েছে। এই **"পিকেটি প্রভাব"** নিশ্চিত করে যে, যাদের সম্পদ আছে তারা কেবল শ্রমের ওপর নির্ভরশীলদের চেয়ে দ্রুত ধনী হন।

৪. **অপ্রাতিষ্ঠানিকতা ও চাকরির মেরুকরণ:** ভারতের **৯০% শ্রমিক এখনও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে** কাজ করেন, যেখানে কোনো সামাজিক সুরক্ষা বা ইউনিয়নের ক্ষমতা নেই। এর ফলে দেশে একটি 'দ্বৈত অর্থনীতি' তৈরি হয়েছে যেখানে একদল সুবিধা পাচ্ছে আর অন্যদল পিছিয়ে পড়ছে।

৫. **নারীদের কর্মক্ষেত্রে কম অংশগ্রহণ (FLFP):** সামাজিক বাধার কারণে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র **১৫.৭%**-এর আশেপাশে। এর ফলে কোটি কোটি পরিবার বাড়তি আয় থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যা সামগ্রিক আর্থিক উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

৬. **মানবিক পুঁজির কাঠামোগত অভাব:** উন্নত স্বাস্থ্যসেবা এবং উন্নতমানের শিক্ষার সুযোগ সবার জন্য সমান নয়। ধনী পরিবারের সন্তানরা ভালো সুযোগ পেলেও গরিবরা মানহীন শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের চক্রে আটকা পড়ে থাকেন।

বৈষম্য কমাতে সরকারের মূল উদ্যোগ

১. **বিকশিত ভারত—G RAM G আইন, ২০২৫:** এটি MGNREGA-এর পরিবর্তে আনা হয়েছে। এখানে কর্মসংস্থানের গ্যারান্টি ১০০ দিন থেকে বাড়িয়ে **১২৫ দিন** করা হয়েছে এবং প্রতিটি যোগ্য গ্রামীণ পরিবারকে এই সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

২. **প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনা (PMGKAY) সম্প্রসারণ:** এই খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্প **২০২৮ সালের ডিসেম্বর** পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। এর মাধ্যমে ৮০ কোটির বেশি মানুষকে প্রতি মাসে ৫ কেজি করে বিনামূল্যে চাল/গম দেওয়া হচ্ছে, যা মুদ্রাস্ফীতির বাজারে গরিবদের রক্ষা করছে।

৩. **অপ্রার্থিষ্ঠানিক ও গিগ কর্মীদের সামাজিক সুরক্ষা (e-Shram):** ২০২৫-এর শেষ নাগাদ নতুন সামাজিক সুরক্ষা বিধি কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে গিগ কর্মীদের (যেমন ডেলিভারি বয়) e-Shram পোর্টালের আওতায় আনা হচ্ছে। এর মাধ্যমে তারা ডিজিটাল আইডি (UAN) এবং আয়ুষ্মান ভারতের স্বাস্থ্য সুবিধা পাবেন।

৪. **PMAY ২.০ (শহর ও গ্রামীণ):** ২০২৪-এর শেষে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে আরও **৩ কোটি নতুন বাড়ি** তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। ভূমিহীন ও শহুরে দরিদ্রদের স্থায়ী সম্পদ (বাড়ি) প্রদানের মাধ্যমে এটি সম্পদ বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে।

৫. **জাতীয় সামাজিক সহায়তা কর্মসূচী (NSAP) স্যাচুরেশন:** ২০২৬-২৭ সালের মধ্যে বৃদ্ধ, বিধবা ও দিব্যাঙ্গদের পেনশনের সুবিধা ১০০% মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে (DBT) টাকা পাঠানোর ফলে মাঝপথে অর্থ চুরির ভয় থাকছে না।

৬. **প্রধানমন্ত্রী জন বিকাশ কার্যক্রম (PMJVK):** পিছিয়ে পড়া এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল, হাসপাতাল এবং স্কিল ল্যাব তৈরির মাধ্যমে এই প্রকল্প **আঞ্চলিক বৈষম্য** দূর করতে কাজ করছে।

ভবিষ্যৎ পথ

১. **সার্বজনীন সামাজিক সুরক্ষা:** ই-শ্রম পোর্টালের মাধ্যমে সব অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মীকে পেনসন ও বিমার আওতায় এনে তাদের জীবনযাত্রার মান নিশ্চিত করতে হবে।

২. **প্রগতিশীল রাজস্ব নীতি:** ধনীদের ওপর সম্পদ কর বা উত্তরাধিকার কর আরোপের বিষয়গুলো ভেবে দেখা যেতে পারে। পাশাপাশি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর GST **কমিয়ে** সাধারণ মানুষের ওপর চাপের বোঝা কমাতে হবে।

৩. **সেবামূলক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ:** শিশু ও বৃদ্ধদের যত্নের জন্য সরকারি পরিকাঠামো বাড়ালে মহিলারা কর্মক্ষেত্রে যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবেন, যা পারিবারিক আয় বাড়াতে সাহায্য করবে।

৪. **মানসম্মত শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ওপর গুরুত্ব:** কেবল সুযোগ নয়, বরং শিক্ষার 'মান' এবং স্বাস্থ্যের 'ফলাফল'-এর ওপর জোর দিতে হবে যাতে বংশপরম্পরায় চলতে থাকা দারিদ্র্যের চক্র ভাঙা যায়।

৫. **শ্রম-নিবিড় উৎপাদন:** বস্ত্র ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের মতো শিল্পে উৎসাহ (PLI ২.০) দিতে হবে যাতে সাধারণ শ্রমিকদের জন্য বিপুল কর্মসংস্থান তৈরি হয়।

৬. **গ্রামীণ শিল্পায়ন: বিকশিত ভারত মিশন (গ্রামীণ)**-এর মাধ্যমে গ্রামে কৃষিনির্ভর কলকারখানা গড়ে তুলতে হবে। এতে গ্রাম থেকে শহরে কাজের জন্য পালানোর প্রবণতা কমবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতি শক্তিশালী হবে।

উপসংহার

২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গড়তে হলে ভারতকে অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে কাঠামোগত ব্যবধানগুলো ঘোচাতে হবে। সামাজিক নিরাপত্তা, ন্যায্য কর ব্যবস্থা এবং গ্রামীণ শিল্পায়নকে অগ্রাধিকার দিলে সমৃদ্ধি সবার মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হবে এবং কোনো নাগরিকই পিছিয়ে থাকবে না।

Q. Inequality in the ownership pattern of resources is one of the major causes of poverty. Discuss in the context of 'paradox of poverty'. (15 Marks)

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | IAS 10-Month GS PCM | Degree + IAS | Prelims Test Series

সাধারণ অধ্যয়ন ৩

2.1. অর্থনীতি

2.1.1. খণ্ডিত বিশ্বব্যবস্থায় ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা

প্রেক্ষাপট

পশ্চিম এশিয়ার সাম্প্রতিক সংঘাত এবং **রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ** এটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ভূ-রাজনৈতিক সংকট কীভাবে সরাসরি ভারতের অর্থনীতিকে, বিশেষ করে **জালানির দাম** এবং **সরবরাহ শৃঙ্খলকে** (Supply Chains) প্রভাবিত করে। ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা এখন আর কেবল সস্তায় আমদানির বিষয় নয়; এটি এখন **স্থিতিস্থাপকতা, উৎস বৈচিত্র্যকরণ** এবং **কৌশলগত প্রস্তুতির** ওপর নির্ভরশীল।

জালানি নিরাপত্তার বিবর্তনশীল ধারণা

- **"সস্তা জ্বালানি" থেকে "মজবুত সুরক্ষা"** (Strong Buffers)**:** জালানি নিরাপত্তা এখন আর কেবল সর্বনিম্ন দাম খোঁজার বিষয় নয়, বরং এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা আকস্মিক **বৈশ্বিক ধাক্কা** সামলে টিকে থাকতে পারে। দেশগুলো এখন সাধারণ বাজার দক্ষতার চেয়ে **আর্থিক নিরাপত্তাকে** বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এর জন্য তারা "বিমা" হিসেবে অতিরিক্ত **জালানি সঞ্চয়** এবং বাড়তি সরবরাহ ক্ষমতা রাখার জন্য বেশি খরচ করতেও প্রস্তুত।
- **উৎস বৈচিত্র্যকরণ এবং "পছন্দ করার ক্ষমতা"** (Power of Choice)**:** প্রকৃত নিরাপত্তা এখন নির্ভর করে একগুচ্ছ বৈচিত্র্যময় সরবরাহকারীর ওপর। এটি কোনো একটি অঞ্চল অস্থির হয়ে পড়লে দ্রুত অন্য উৎসে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেয়। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখেও **রুশ তেল আমদানির** ভারসাম্য রক্ষা করা ভারতের এই **"কৌশলগত নমনীয়তা"** বা পছন্দের ক্ষমতার একটি বড় উদাহরণ।
- **সামুদ্রিক পথের ঝুঁকি** (Fragility of Sea Lanes)**:** অনেক সরবরাহকারী থাকলেও তেলের ভৌত পরিবহন একটি বড় ঝুঁকি হিসেবে রয়ে গেছে কারণ এটি প্রায়ই **"হরমুজ প্রণালী"র** (Strait of Hormuz) মতো সংকীর্ণ পথ দিয়ে আসে। বিশ্বের ২৫% তেল এই ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা দিয়ে যাতায়াত করে, তাই এখন জ্বালানি আমদানির মতোই **নৌ-শক্তির** মাধ্যমে সমুদ্রপথ রক্ষা করা সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
- **নতুন "সবুজ" জ্বালানির দুর্বলতা** (Green Vulnerabilities)**:** নবায়নযোগ্য শক্তির দিকে অগ্রসর হওয়া তেলের ওপর নির্ভরতা কমায় ঠিকই, কিন্তু এটি **লিথিয়াম** এবং **রেয়ার আর্থ** (Rare Earths) খনিজের ওপর নতুন নির্ভরতা তৈরি করে। এটি একটি নতুন চ্যালেঞ্জ, কারণ এই গুরুত্বপূর্ণ খনিজগুলোর প্রক্রিয়াকরণ বর্তমানে একটি মাত্র দেশের (চীন) নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, যা ভবিষ্যতে একটি নতুন সংকটের পথ তৈরি করতে পারে।
- **অর্থনীতির ঢাল হিসেবে জ্বালানি:** স্থিতিশীল জ্বালানি সরবরাহ এখন অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, যা সরাসরি **মুদ্রাস্ফীতি** এবং **উন্নয়নকে** প্রভাবিত করে। সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করার মাধ্যমে একটি দেশ তার নাগরিকদের "আমদানিকৃত" অর্থনৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করে এবং নিশ্চিত করে যে বৈশ্বিক অস্থিরতা যেন দেশের সমৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত না করে।

বিশ্ব জ্বালানি বাজার: পুরনো ব্যবস্থার পতন

- **পাইপলাইন থেকে সমুদ্রপথের দিকে:** রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পাইপলাইনের নির্ভরযোগ্যতার ধারণা ভেঙে দিয়েছে এবং বিশ্বকে সমুদ্রপথে পরিবহণযোগ্য LNG-র দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই পরিবর্তন **হরমুজ প্রণালীর** মতো সামুদ্রিক পথগুলোর কৌশলগত গুরুত্ব বাড়িয়ে দিয়েছে, যেখানে স্থানীয় সংঘাত এখন বিশ্বব্যাপী তেলের দাম নির্ধারণ করে।

- **সঞ্চয়ের চেয়ে নিরাপত্তাকে অগ্রাধিকার:** কম খরচে "প্রয়োজন মতো" জ্বালানি কেনার পুরনো মডেল এখন শেষ। এর জায়গা নিয়েছে **"নিরাপত্তা-প্রথম"** কৌশল। জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলো এখন জ্বালানিকে একটি **বিমা পলিসি** হিসেবে দেখছে এবং সরবরাহ সংকট মোকাবিলায় বিশাল **কৌশলগত মজুদ** (Strategic Reserves) গড়ে তোলার জন্য প্রচুর বিনিয়োগ করছে।
- **পছন্দের ক্ষমতা এবং ক্রেতার আধিপত্য:** একটি মাত্র সরবরাহকারীর ওপর দশকের পর দশক ধরে নির্ভরশীল থাকার দিন শেষ। ভারতের মতো বড় আমদানিকারকরা এখন রাশিয়া, আমেরিকা এবং উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে তাদের উৎসকে **বৈচিত্র্যময়** করছে। এই **"অপশনালিটি"** বা বিকল্প বেছে নেওয়ার ক্ষমতা ক্রেতাদের হাতে শক্তি দিচ্ছে, যাতে তারা ভৌগোলিক অবস্থানের বদলে ভূ-রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ভিত্তিতে সরবরাহকারী পরিবর্তন করতে পারে।
- **রাশিয়ান গ্যাসের ওপর ইউরোপের নির্ভরতার অবসান:** সস্তা রুশ গ্যাসের ওপর ইউরোপের নির্ভরতার যুগ (যা একসময় তাদের চাহিদার ৪৫% মেটাতো) স্থায়ীভাবে শেষ হয়ে গেছে। এই পতনের ফলে ইউরোপীয় জ্বালানি ব্যবস্থায় দ্রুত আমূল পরিবর্তন আনতে হয়েছে, যার ফলে গ্যাসের ব্যবহার ২০% কমেছে এবং তারা পুরোপুরি বৈশ্বিক **LNG বাজারের** দিকে ঝুঁকেছে।
- **সবুজ রূপান্তরের নতুন ঝুঁকি:** জালানি বাজারের এই পরিবর্তন এমন এক সময়ে ঘটছে যখন **লিথিয়াম** এবং **রেয়ার আর্থের** মতো খনিজের ওপর নতুন করে নির্ভরতা তৈরি হচ্ছে। বৈশ্বিক ঝুঁকি এখন "মাটি থেকে জ্বালানি তোলা" থেকে সরে গিয়ে **"খনিজ প্রক্রিয়াকরণ নিয়ন্ত্রণ করার"** দিকে যাচ্ছে। এটি সেইসব দেশগুলোর ওপর নতুন ভূ-রাজনৈতিক নির্ভরতা তৈরি করছে যারা ব্যাটারি সরবরাহ শৃঙ্খলে আধিপত্য বিস্তার করে।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তায় সরকারি উদ্যোগ

১. **কৌশলগত এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তা**

- **অপারেশন সংকল্প** (Operation Sankalp)**:** হরমুজ প্রণালী এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজগুলোর নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করতে ভারতীয় নৌবাহিনী এই অভিযান শুরু করেছে।
- **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ** (SPR) **কর্মসূচি:** সরবরাহ শৃঙ্খলে কোনো বিপর্যয় ঘটলে "জাতীয় বিমা" হিসেবে কাজ করার জন্য ভারত বিশাল ভূগর্ভস্থ তেল মজুদাগার তৈরি করছে। আমদানিনির্ভরতা কমাতে এবং জরুরি অবস্থায় টিকে থাকার দিন সংখ্যা বাড়াতে **বিশাখাপত্তনম, ম্যাঙ্গালুরু এবং পাদুরে** বর্তমান মজুদ ক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

২. **জ্বালানি উৎসের বৈচিত্র্যকরণ**

- **ন্যাশনাল গ্রিন হাইড্রোজেন মিশন** (NGHM)**:** ১৯,৭৪৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই মিশনের লক্ষ্য ভারতকে **গ্রিন হাইড্রোজেনের** বিশ্বব্যাপী হাবে পরিণত করা। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর ৫ MMT উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জীবাশ্ম জ্বালানি আমদানিতে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সাশ্রয় করতে পারে।
- **প্রধানমন্ত্রী জি-ভান যোজনা** (PM JI-VAN)**:** দ্বিতীয় প্রজন্মের (2G) **বায়ো-ইথানল** তৈরির পরিবেশ তৈরি করাই এর লক্ষ্য। কৃষিজ বর্জ্য (যেমন খড়) জ্বালানিতে রূপান্তরের মাধ্যমে এটি **ইথানল ব্লেন্ডিং প্রোগ্রাম** (EBP)-কে সহায়তা করে এবং আমদানিকৃত তেলের ওপর নির্ভরতা কমায়।
- **পিএম-কুসুম** (PM-KUSUM) **এবং পিএম সূর্য ঘর:** এই প্রকল্পগুলো কৃষি এবং গৃহস্থালি পর্যায়ে সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়াতে কাজ করে, যাতে জাতীয় গ্রিডের ওপর চাপ কমে এবং সরকারি ভর্তুকির খরচ হ্রাস পায়।

৩. **ভবিষ্যতের প্রযুক্তি সুরক্ষিত করা**

- **ন্যাশনাল ক্রিটিক্যাল মিনারেল মিশন** (NCMM)**:** ২০২৫ সালে শুরু হওয়া এই মিশনটি ইলেকট্রিক ভেহিকেল (EV) এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর প্রধান দিকগুলো হলো:
  - **দেশীয় অনুসন্ধান:** লিথিয়াম এবং কোবাল্টের মতো খনিজের জন্য ১,২০০টিরও বেশি স্থানকে লক্ষ্য করা হয়েছে।

- **বিদেশি সম্পদ অর্জন:** KABIL (খনিজ বিদেশ ইন্ডিয়া লিমিটেড)-এর মাধ্যমে ভারত দক্ষিণ আমেরিকার "লিথিয়াম ট্রায়াঙ্গেল" এবং অস্ট্রেলিয়ায় খনিজ সম্পদ আহরণ নিশ্চিত করছে।
- **পুনর্ব্যবহার প্রণোদনা:** ই-বর্জ্য এবং পুরনো ব্যাটারি থেকে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পুনরুদ্ধারের জন্য ১,৫০০ কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

৪. ভূ-রাজনীতি এবং কূটনীতি

- **ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (ISA):** ভারতের নেতৃত্বে একটি বিশ্বব্যাপী প্ল্যাটফর্ম, যা বিশেষ করে রৌদ্রোজ্জ্বল দেশগুলোতে সৌরশক্তির বিস্তার ঘটায় এবং জীবাশ্ম জ্বালানি সমৃদ্ধ দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা কমায়।
- **গ্লোবাল বায়োফুয়েলস অ্যালায়েন্স (GBA):** বায়োফুয়েলের ব্যবহার ত্বরান্বিত করতে ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির সময় এটি চালু করা হয়েছিল, যা জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা এবং বৈচিত্র্য আনবে।

ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার চ্যালেঞ্জসমূহ

- **অত্যধিক আমদানি নির্ভরতা:** ভারত কাঠামোগতভাবে এখনও দুর্বল, কারণ আমাদের অপরিশোধিত তেলের চাহিদার প্রায় ৯০% আমদানি করতে হয়। এটি বৈশ্বিক অশান্তির সাথে সরাসরি ভারতের **মুদ্রাস্ফীতি** এবং **জিডিপি প্রবৃদ্ধিকে** যুক্ত করে।
- **ভৌগোলিক এবং সামুদ্রিক বাধা:** সরবরাহকারী পরিবর্তন করলেও **"চোকপয়েন্ট"** বা সংকীর্ণ সামুদ্রিক পথের সমস্যা মেটে না। ভারতের আমদানির প্রায় ৪৫% এখনও **হরমুজ প্রণালী** দিয়ে আসে। এই পথে উত্তেজনার কারণে 'অপারেশন সংকল্প'-এর মতো ব্যয়বহুল সামরিক হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।
- **প্রক্রিয়াকরণের একচেটিয়া আধিপত্য:** সবুজ জ্বালানির দিকে এগিয়ে যাওয়ার অর্থ হলো লিথিয়াম এবং কোবাল্টের মতো খনিজের ওপর নতুন নির্ভরতা। বর্তমানে চীন এই খনিজগুলোর ৯০%-এর বেশি উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করে। ভারত তার প্রয়োজনীয় ব্যাটারি-গ্রেড খনিজের মাত্র ৫% প্রক্রিয়াকরণ করতে পারে, যা তেল-নির্ভরতা থেকে সরে এসে খনিজ-নির্ভরতার ঝুঁকি তৈরি করে।
- **কৌশলগত মজুদের অপর্যাপ্ততা:** জাপানের মতো দেশগুলোর (২৫৪ দিনের মজুদ) তুলনায় ভারতের **কৌশলগত পেট্রোলিয়াম রিজার্ভ (SPR)** এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে। বর্তমান মজুদ ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী বৈশ্বিক সরবরাহ সংকট মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট নয়।
- **জ্বালানি রূপান্তরের দ্বিধা (Paradox):** সৌরশক্তি এবং ইভি-র ব্যবহার দীর্ঘমেয়াদে তেলের চাহিদা কমালেও, স্বল্পমেয়াদে নতুন পরিকাঠামো তৈরির খরচ অনেক বেশি। খনিজ সরবরাহ নিশ্চিত না করে দ্রুত রূপান্তর ঘটলে উপকারের বদলে জ্বালানি বাজার আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

ভবিষ্যতের পথ

- **কৌশলগত মজুদের (SPR) বিস্তার:** জাপানের মতো স্থিতিস্থাপকতা অর্জন করতে ভারতকে দ্রুত ভূগর্ভস্থ তেলের মজুদ ক্ষমতা বাড়াতে হবে। এটি সরবরাহ সংকটের সময় সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করবে।
- **খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল নিশ্চিত করা:** চীনের ওপর নির্ভরতা এড়াতে ভারতকে KABIL-এর মাধ্যমে **"খনিজ কূটনীতি"** জোরদার করতে হবে। দেশের অভ্যন্তরেও খনিজ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা গড়ে তোলা জরুরি।
- **সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা ও কূটনীতি শক্তিশালী করা:** হরমুজ প্রণালীর মতো গুরুত্বপূর্ণ পথগুলো রক্ষা করতে ভারতীয় নৌবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। 'অপারেশন সংকল্প'-এর মতো উদ্যোগগুলোকে আঞ্চলিক অংশীদারদের সাথে একটি বৃহত্তর কাঠামোর অধীনে আনতে হবে।
- **কার্বন নিঃসরণ হ্রাস এবং চাহিদা ব্যবস্থাপনা:** ইভি-র জন্য FAME-II প্রকল্প দ্রুত কার্যকর করে তেলের তীব্রতা কমাতে হবে। গ্রিন হাইড্রোজেন এবং বায়োফুয়েল উৎসাহিত করলে শিল্পখাত তেলের দামের ওঠানামা থেকে মুক্তি পাবে।

- **বাজারের শক্তি ব্যবহার করা:** ভারত তেলের চাহিদার একটি বড় কেন্দ্র হওয়ায়, আমদানির ক্ষেত্রে আরও ভালো শর্ত ও ডিসকাউন্ট নিশ্চিত করতে দরকষাকষির ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে।

উপসংহার

ভারতকে সাময়িক কৌশলগত পদক্ষেপের বদলে **কাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতার** দিকে এগোতে হবে। খনিজ সরবরাহ শৃঙ্খল সুরক্ষিত করে এবং কৌশলগত মজুদ বাড়িয়ে ভারত তার অর্থনীতিকে ভূ-রাজনৈতিক ধাক্কা থেকে মুক্ত করতে পারবে। এটি একটি **টেকসই এবং স্বনির্ভর** জ্বালানি ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে।

Q. "Energy security in the 21st century is no longer limited to access to oil, but includes resilience, diversification and supply-chain security." Discuss in the context of India's changing geopolitical environment. (15 Marks)

2.2. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

2.2.1. ভারতের নগর অগ্নি নিরাপত্তা: চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিকার

প্রেক্ষাপট

দিল্লির সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডগুলি (শাহদারা, পালাম, দ্বারকা) **নগর পরিকল্পনা**, ভবনের নিরাপত্তা প্রোটোকল এবং তীব্র গ্রীষ্মের মাসগুলিতে **বৈদ্যুতিক পরিকাঠামোর** মধ্যে থাকা মারাত্মক ত্রুটিগুলিকে সামনে এনেছে।

ভূমিকা

নগর অগ্নি নিরাপত্তা বলতে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় আগুনের ঝুঁকি কমানোর জন্য ডিজাইন করা প্রতিরোধমূলক এবং সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাকে বোঝায়। ভারতে দ্রুত নগরায়নের ফলে প্রায়ই **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC)** লঙ্ঘন করা হয়, যা এড়ানো সম্ভব এমন অনেক ট্র্যাজেডির জন্ম দেয়।

ভারতে নগর অগ্নি নিরাপত্তার সাংবিধানিক বিধান

- **ধারা ২৪৩ডব্লিউ (243W) এবং ১২তম তফসিল:** ১৯৯২ সালের **৭৪তম সংবিধান সংশোধনী আইনের** মাধ্যমে এটি চালু করা হয়।
    - ১২তম তফসিলের **৭ নম্বর এন্ট্রি** হিসেবে **"অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা" (Fire Services)** তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
    - এটি পৌরসভাগুলিকে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ এবং জীবন রক্ষার কাজ করার ক্ষমতা দেয়।
- **রাজ্য তালিকা (এন্ট্রি ৬):** জনস্বাস্থ্য এবং স্যানিটেশন, যার মধ্যে অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত, তা ব্যক্তিগতভাবে **রাজ্যগুলির** আইনি এক্তিয়ারের অধীনে পড়ে।

ভারতে ঘনঘন নগর অগ্নিকাণ্ডের কারণ

১. **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) লঙ্ঘন:** অনেক ভবনে বাধ্যতামূলক **অগ্নি নির্গমন পথ** (Fire Exits), খোলা ছাদ এবং রিফিউজ এরিয়া (আশ্রয়স্থল) নেই। অননুমোদিত নির্মাণ এবং অবৈধ সম্প্রসারণ প্রায়ই বাতাস চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয়, যা আগুনের সময় ভবনটিকে **"ধোঁয়ার প্রকোষ্ঠে"** পরিণত করে।

২. **বৈদ্যুতিক ওভারলোডিং এবং নিম্নমানের ওয়্যারিং:** গ্রীষ্মকালে এসি-র মতো উচ্চ-শক্তির সরঞ্জামের ব্যবহার পুরনো তারের ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। **মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার (MCB)** বাইপাস করার ফলে শর্ট সার্কিটের সময় সিস্টেমটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হতে পারে না।

৩. **নিরাপত্তা ব্যবস্থার নেতিবাচক প্রভাব:** চুরির ভয়ে বারান্দা এবং জানালায় স্থায়ী **লোহার গ্রিল** লাগানো হয়, যা বিপদের সময় বাসিন্দাদের ভেতরে আটকে ফেলে। একইভাবে, আধুনিক **ইলেকট্রনিক লক** বিদ্যুৎ বিভ্রাট বা আগুনের সময় প্রায়ই কাজ করতে ব্যর্থ হয়।

৪. **অদক্ষ নগর পরিকল্পনা এবং যানজট:** সরু গলি এবং মাথার ওপর ঝুলে থাকা **বিপজ্জনক বিদ্যুতের তার** দমকলের গাড়িগুলিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে বাধা দেয়। অবৈধ পার্কিং এবং নিচু প্রবেশদ্বারগুলি ভারী হাইড্রোলিক সরঞ্জাম চলাচলে সমস্যা তৈরি করে।

৫. **মিশ্র-ব্যবহারের ভবনের অবহেলা:** আবাসিক ভবনগুলিকে প্রায়শই ছোট কারখানা বা **দাহ্য পদার্থের গুদাম** হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এই জায়গাগুলিতে অগ্নি নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় কঠোর প্রোটোকল মানা হয় না।

৬. **অডিট এবং প্রয়োগের অভাব:** স্থানীয় পৌরসভাগুলিতে পরিদর্শকের অভাবে প্রায়ই নথিপত্র পরীক্ষা না করেই Fire NOC দেওয়া হয়। নিয়মিত অডিট না হওয়ায় স্মোক ডিটেক্টর এবং স্প্রিঙ্কলারের মতো সরঞ্জামগুলি অকেজো হয়ে থাকে।

ভারতে নগর অগ্নি নিরাপত্তার জন্য সরকারি উদ্যোগ

১. আইনি ও নীতিগত কাঠামো

- **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) ২০১৬:** ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (BIS) দ্বারা প্রকাশিত এই কোডের ৪র্থ অংশ অগ্নি নিরাপত্তার প্রধান নির্দেশিকা। এটি উচ্চ ভবনে **অগ্নি-প্রতিরোধী দরজা**, নির্দিষ্ট প্রস্থের প্রস্থানের পথ এবং অগ্নি নির্বাপক লিফটের মতো কাঠামোগত প্রয়োজনীয়তা বাধ্যতামূলক করে।
- **মডেল বিল্ডিং বাই-ল (২০১৬):** আবাসন ও নগর বিষয়ক মন্ত্রক (MoHUA) দ্বারা জারি করা এই নির্দেশিকা স্থানীয় পৌরসভাগুলিকে তাদের ভবন অনুমোদনের প্রক্রিয়ায় NBC-**র মানদণ্ড** অন্তর্ভুক্ত করতে সহায়তা করে।

২. প্রাতিষ্ঠানিক ও কৌশলগত নির্দেশিকা

- NDMA **নির্দেশিকা (২০১২):** ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি অগ্নি ও জরুরি পরিষেবার আধুনিকীকরণের জন্য নির্দিষ্ট প্রোটোকল জারি করেছে। এটি রাজ্য সরকারগুলির প্রশিক্ষণ, জনবল এবং সরঞ্জাম বৃদ্ধির জন্য একটি রোডম্যাপ প্রদান করে।
- SFAC (Standing Fire Advisory Council)**:** স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে কর্মরত এই সংস্থাটি অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সরকারকে প্রযুক্তিগত পরামর্শ দেয়।

৩. আর্থিক আধুনিকীকরণ (১৫তম অর্থ কমিশন)

পরিকাঠামোগত ব্যবধান দূর করতে **১৫তম অর্থ কমিশন** উল্লেখযোগ্য বাজেট বরাদ্দ করেছে:

- **রাজ্য-স্তরের বরাদ্দ:** রাজ্যগুলিতে **"অগ্নি নির্বাপক পরিষেবার আধুনিকীকরণের"** জন্য প্রায় **৫,০০০ কোটি টাকা** নির্ধারণ করা হয়েছে।
- **নগর অনুদান:** নগর স্থানীয় সংস্থাগুলির জন্য নির্দিষ্ট প্রযুক্তিগত অনুদানের একটি অংশ **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সক্ষমতা** এবং অগ্নি প্রস্তুতি বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

প্রযুক্তিগত এবং সামাজিক উদ্যোগ

- **অগ্নি নিরাপত্তা অডিট (Fire Safety Audits):** হাসপাতাল ও মলের মতো **"বিশেষ ভবন"** গুলিতে সার্টিফাইড অডিটর দ্বারা নিয়মিত পরিদর্শন এবং Fire NOC নবায়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

- **ন্যাশনাল ফায়ার সার্ভিস কলেজ (NFSC):** নাগপুরে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে এই প্রতিষ্ঠানটি পেশাদার ফায়ার অফিসার তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ এবং ডিগ্রি কোর্স প্রদান করে।
- **আপদা মিত্র প্রকল্প (Aapda Mitra Scheme):** এটি একটি সম্প্রদায়-ভিত্তিক উদ্যোগ যেখানে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদের দুর্যোগ উদ্ধার, প্রাথমিক অগ্নি নিরাপত্তা এবং প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- **অগ্নি নির্বাপক পরিষেবা সপ্তাহ (Fire Service Week):** সচেতনতা বাড়াতে প্রতি বছর **১৪ থেকে ২০শে এপ্রিল** পর্যন্ত এটি পালন করা হয়, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে মক ড্রিল এবং নিরাপত্তার পাঠ দেওয়া হয়।

নগর অগ্নি ব্যবস্থাপনার চ্যালেঞ্জসমূহ

পৌরসভার দুর্বল প্রয়োগ: দুর্নীতি বা কারিগরি কর্মীর অভাবে ভবন নির্মাণের সময় বিল্ডিং বাই-ল এবং **ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC)**-এর মানদণ্ডগুলি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়।

- **পুরানো পরিকাঠামো:** শহরের পুরানো ও ঘিঞ্জি এলাকাগুলোতে সরু গলি এবং মাথার ওপর ঝুলে থাকা বৈদ্যুতিক তার আধুনিক দমকলের গাড়ি প্রবেশে শারীরিক বাধা সৃষ্টি করে।
- **জনবল ও সরঞ্জামের অভাব:** অধিকাংশ রাজ্যের অগ্নি নির্বাপক পরিষেবাগুলোতে প্রচুর শূন্যপদ রয়েছে এবং উচ্চ ভবনে আগুন নেভানোর জন্য প্রয়োজনীয় **লং-রিচ হাইড্রোলিক ল্যাডার** বা উন্নত সরঞ্জামের অভাব রয়েছে।
- **সক্রিয় সুরক্ষা ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণে অভাব:** অনেক ভবনে স্মোক ডিটেক্টর এবং স্প্রিঙ্কলারের মতো সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন করা হলেও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সেগুলো সময়ের সাথে সাথে অকেজো হয়ে পড়ে।
- **অনিয়ন্ত্রিত মিশ্র-ব্যবহারের ভবন:** আবাসিক এলাকায় ছোট শিল্প কারখানা এবং গুদামঘরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা তৈরি হচ্ছে, যেখানে যথাযথ শিল্প নিরাপত্তা প্রোটোকল মানা হয় না।
- **জনসচেতনতার অভাব:** সাধারণ মানুষের মধ্যে "নিরাপত্তা সংস্কৃতির" অভাবের কারণে তারা জরুরি নির্গমন পথ বন্ধ করে দেয় বা স্থায়ী **লোহার গ্রিল** স্থাপন করে, যা বিপদের সময় ঘরগুলোকে মৃত্যুকূপে পরিণত করে।

নগর অগ্নি নিরাপত্তায় আন্তর্জাতিক সেরা অনুশীলন

দেশ	অনুশীলনের নাম	ব্যাখ্যা
আমেরিকা (USA)	NFPA স্ট্যান্ডার্ড এবং NEC কমপ্লায়েন্স	ন্যাশনাল ফায়ার প্রোটেকশন অ্যাসোসিয়েশন (NFPA) ৩০০টিরও বেশি কোড নির্ধারণ করেছে। এর মধ্যে **ন্যাশনাল ইলেকট্রিক্যাল কোড (NEC)** প্রতি ৩ বছর অন্তর আপডেট করা হয় যাতে উন্নত সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক আগুন রোধ করা যায়।
জাপান	অগ্নি-সহনশীল নগর পরিকল্পনা (Bousai)	টোকিওতে **"ফায়ার কন্টেইনমেন্ট জোন"** এবং ভূমিকম্প-সহনশীল বিল্ডিং কোড ব্যবহার করা হয়। এতে স্বয়ংক্রিয় গ্যাস শাট-অফ ভালভ এবং **"সিসমিক ব্রেকার"** বাধ্যতামূলক করা হয়েছে যাতে দুর্যোগ পরবর্তী আগুন রোধ করা যায়।
সিঙ্গাপুর	বাধ্যতামূলক ফায়ার সেফটি ম্যানেজার (FSM)	সিঙ্গাপুর সিভিল ডিফেন্স ফোর্স (SCDF) সমস্ত সরকারি ও শিল্প ভবনের জন্য একজন প্রত্যয়িত **ফায়ার সেফটি ম্যানেজার** নিয়োগ বাধ্যতামূলক করেছে, যারা বছরে দুবার মক ড্রিল এবং প্রতিদিন নিরাপত্তা অডিট নিশ্চিত করেন।

নগর অগ্নি নিরাপত্তার ভবিষ্যৎ পথ

১. **NBC-এর কঠোর প্রয়োগ:** পৌরসভাগুলিকে **সম্পত্তি কর এবং বিমার প্রিমিয়ামকে** ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (NBC) পালনের সাথে যুক্ত করতে হবে, যাতে নিরাপত্তা কেবল একটি পছন্দ নয় বরং একটি আর্থিক উৎসাহে পরিণত হয়।

২. **বাধ্যতামূলক বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা অডিট:** ১৫ বছরের বেশি পুরনো ভবনগুলোর জন্য পর্যায়ক্রমিক তৃতীয়-পক্ষীয় বৈদ্যুতিক পরিদর্শন চালু করতে হবে যাতে **ওভারলোডেড সার্কিট** শনাক্ত করা যায় এবং উন্নত মানের সার্কিট ব্রেকার স্থাপন নিশ্চিত করা যায়।

৩. **অগ্নি নির্বাপক পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ: ১৫তম অর্থ কমিশনের অনুদান** ব্যবহার করে সরু গলিতে প্রবেশযোগ্য ছোট দমকল গাড়ি, ড্রোনের মাধ্যমে নজরদারি এবং আইওটি (IoT) ভিত্তিক হাইড্রেন্ট স্থাপন করতে হবে যা জলের স্তর কমলে সংকেত দেবে।

৪. **রেট্রোফিটিং এবং নকশা উদ্ভাবন:** ঘিঞ্জি আবাসিক এলাকায় নিরাপত্তা এবং জরুরি নির্গমন—উভয়ই বজায় রাখতে **"সুইং-অ্যাওয়ে" বা খোলা যায় এমন গ্রিল** এবং অগ্নি-প্রতিরোধী নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার উৎসাহিত করতে হবে।

৫. **সম্প্রদায়-ভিত্তিক প্রস্তুতি: আপদা মিত্র** প্রকল্পকে আরও বিস্তৃত করতে হবে যাতে প্রতিটি আবাসিক কল্যাণ সমিতিতে (RWA) একদল **"ফায়ার মিত্র"** তৈরি করা যায় যারা নিয়মিত মক ড্রিল এবং নির্গমন পথ পরিষ্কার রাখা তদারকি করবেন।

৬. **প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা:** বড় আবাসিক কমপ্লেক্সের জন্য সিঙ্গাপুরের মডেলে **প্রত্যয়িত ফায়ার সেফটি ম্যানেজার** নিয়োগের নীতি গ্রহণ করতে হবে, যারা অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য আইনত দায়বদ্ধ থাকবেন।

উপসংহার

নগর অগ্নি নিরাপত্তাকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল পরিষেবা থেকে সরিয়ে **সক্রিয় সুশাসনের** একটি স্তম্ভে পরিণত করতে হবে। **NBC কমপ্লায়েন্স**, প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ এবং জন-প্রস্তুতির সমন্বয়ে ভারত এমন স্থিতিস্থাপক শহর গড়ে তুলতে পারে যেখানে কাঠামোগত সুবিধার চেয়ে মানুষের জীবনকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

Q. Recent urban fire accidents in India expose deeper failures in urban planning, electrical safety, and disaster preparedness. Examine the major challenges in ensuring fire safety in Indian cities and suggest measures to improve urban resilience. (15 Marks)

2.3. প্রতিরক্ষা

2.3.1. ভারতের নতুন নিরাপত্তা নীতি

প্রেক্ষাপট

২০২৫ সালের ২২শে এপ্রিল পহalgam-এ হওয়া জঙ্গি হামলার পর, ২০২৫ সালের ৭ই মে ভারত একটি উচ্চ-তীব্রতার প্রতিশোধমূলক হামলা হিসেবে **অপারেশন সিন্দুর** শুরু করে। এটি পাকিস্তানের সন্ত্রাসী পরিকাঠামোর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। এটি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা নীতিতে একটি বড় ধরণের পরিবর্তনের সূচনা করে।

অপারেশন সিন্দুর-এর গুরুত্ব

- **নীতিগত পরিবর্তন:** এটি প্রথাগত "কৌশলগত সংযম"-এর আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটায়। এর ফলে পুরনো "ডোজিয়ার বা নথিপত্র আদান-প্রদান"-এর বদলে **জিরো টলারেন্স (শূন্য সহনশীলতা)** নীতি গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদকে যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হিসেবে গণ্য করা হয়।

- **পারমাণবিক ভীতি দূর করা:** বাহাওয়ালপুর এবং মুরিদকের মতো গভীর লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হেনে ভারত প্রতিপক্ষের পারমাণবিক হুমকিকে তুচ্ছ প্রমাণ করেছে। এটি দেখিয়েছে যে, পারমাণবিক সীমার নিচে থেকেও ভারত উচ্চ-তীব্রতার সামরিক অভিযান চালাতে সক্ষম।
- **কার্যকরী সমন্বয় (Operational Integration):** এই মিশনটি সেনাবাহিনীর তিনটি শাখার (**স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনী**) মধ্যে চমৎকার সমন্বয় ও সংহতির একটি বড় পরীক্ষা ছিল, যা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।
- **প্রযুক্তিগত সার্বভৌমত্ব:** দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্ল্যাটফর্ম এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (যেমন S-400) এই অভিযানে দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। এটি প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে **আত্মনির্ভরশীলতার (Atmanirbharta)** গুরুত্ব প্রমাণ করেছে।

ভারতের নতুন নিরাপত্তা নীতির বৈশিষ্ট্য

- **সক্রিয় প্রতিশোধ:** ভারত এখন কূটনৈতিক "প্রতিক্রিয়াশীল সংযম" থেকে সরে এসে তাৎক্ষণিক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের নীতি নিয়েছে। ভারত এখন আর আন্তর্জাতিক নথিপত্রের ওপর নির্ভর না করে স্বাধীন ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছে।
- **পারমাণবিক ধাপ্পাবাজি মোকাবিলা:** এই নতুন নীতি অনুযায়ী, পারমাণবিক যুদ্ধের ঝুঁকি ছাড়াই সামরিক অভিযানের জন্য একটি নির্দিষ্ট জায়গা খুঁজে বের করা হয়েছে। প্রতিপক্ষের সীমানার অনেক ভেতরে আঘাত হেনে ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে যে, পারমাণবিক শক্তি কোনোভাবেই প্রক্সি ওয়ার বা ছায়াযুদ্ধের ঢাল হতে পারে না।
- **সমন্বিত যুদ্ধ শক্তি:** প্রতিরক্ষা এখন একটি "সমগ্র জাতির প্রচেষ্টা"। এটি স্থল, জল এবং আকাশপথের শক্তির সাথে উন্নত প্রযুক্তির (যেমন S-400) সমন্বয় ঘটিয়ে একটি বিধ্বংসী ও ঐক্যবদ্ধ প্রতিক্রিয়া তৈরির ওপর জোর দেয়।
- **জিরো-টলারেন্স ম্যান্ডেট:** সীমান্ত পারের সন্ত্রাসবাদকে এখন **"যুদ্ধের শামিল"** হিসেবে দেখা হয়। এটি সামরিক বাহিনীকে একটি রাজনৈতিক "মুক্ত হস্ত" প্রদান করে, যাতে তারা আক্রমণের সময় এবং তীব্রতা নিজেরাই নির্ধারণ করতে পারে।

ভারতের জন্য কৌশলগত প্রভাব

১. **প্রতিরক্ষামূলক থেকে সক্রিয় প্রতিরোধে রূপান্তর:** ভারত এখন কেবল আক্রান্ত হওয়ার পর প্রতিক্রিয়া দেখানোর বদলে **"বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ"** গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেছে, যার মধ্যে আগাম আঘাত হানার বিকল্পও অন্তর্ভুক্ত। এর অর্থ হলো জাতীয় অখণ্ডতা রক্ষায় ভারত সীমান্তের ওপারে সন্ত্রাসের উৎসে আঘাত করতে দ্বিধা করবে না।

২. **ইন্টিগ্রেটেড থিয়েটার কমান্ড (ITC):** সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ফলে সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং অপারেশনাল গতি বৃদ্ধি পাবে। এই কাঠামোগত পরিবর্তন হাইব্রিড হুমকি এবং দুই ফ্রন্টের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক সাড়া নিশ্চিত করবে।

৩. **প্রতিরক্ষা প্রযুক্তিতে আত্মনির্ভরশীলতা:** বিদেশি প্রস্তুতকারকদের ওপর নির্ভরতা কমাতে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে ব্যাপক জোর দেওয়া হচ্ছে। এটি ভারতের **কৌশলগত স্বায়ত্তশাসনকে** শক্তিশালী করে এবং বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার সময়েও সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখে।

৪. **মাল্টি-ডোমেইন অপারেশন এবং সাইবার নিরাপত্তা:** নতুন নীতি স্বীকার করে যে আধুনিক যুদ্ধ কেবল স্থল, জল বা আকাশে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি ডিজিটাল এবং মহাকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই তথ্য পরিকাঠামো রক্ষা এবং মহাকাশ-ভিত্তিক নজরদারি বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৫. **বহুপাক্ষিক মৈত্রীর মাধ্যমে কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন:** ভারত একই সাথে বিশ্বের বিভিন্ন শক্তি কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থেকে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বজায় রাখে। এটি ভারতকে Quad এবং BRICS-এর মতো মঞ্চে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি বিশ্ববন্ধু (Vishwa Bandhu) হিসেবে কাজ করার সুযোগ দেয়।

ভারতের নতুন কৌশলগত মতবাদের চ্যালেঞ্জসমূহ

১. **পারমাণবিক উত্তেজনার ঝুঁকি:** পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘনঘন সামরিক প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ দক্ষিণ এশিয়ায় অনিচ্ছাকৃত উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং কৌশলগত অস্থিরতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

২. **উচ্চ সামরিক প্রস্তুতি বজায় রাখা:** একটি সক্রিয় মতবাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সেনা মোতায়েন, **নজরদারি** এবং কর্মক্ষম প্রস্তুতি প্রয়োজন, যা সশস্ত্র বাহিনী ও সম্পদের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে।

৩. **কূটনৈতিক ও বৈশ্বিক চাপ:** সংকটের সময় বড় শক্তিগুলো এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো ভারতকে সংযত থাকার জন্য চাপ দিতে পারে, যা ভারতের কৌশলগত নমনীয়তাকে সীমিত করে।

৪. **অর্থনৈতিক ও আর্থিক বোঝা:** উন্নত প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বজায় রাখা, আধুনিকীকরণ এবং **স্বদেশী উৎপাদন** বৃদ্ধির জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং বিশাল আর্থিক বিনিয়োগের প্রয়োজন হয়।

৫. **সাইবার এবং হাইব্রিড যুদ্ধের হুমকি:** শত্রুরা প্রচলিত যুদ্ধের পরিবর্তে ক্রমবর্ধমানভাবে **সাইবার আক্রমণ**, ড্রোন, ভুল তথ্য প্রচার এবং প্রক্সি এজেন্টদের (পরোক্ষ শক্তি) ব্যবহার করতে পারে।

৬. **স্বদেশী প্রতিরক্ষা সক্ষমতার ওপর নির্ভরশীলতা:** এই মতবাদের সাফল্য নির্ভর করে অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা উৎপাদন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের ওপর। তবে এক্ষেত্রে প্রযুক্তির ঘাটতি এবং আমদানির ওপর নির্ভরশীলতা এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পন্থা

১. **সমন্বিত থিয়েটার কমান্ড (Integrated Theatre Commands) শক্তিশালী করা:** ভবিষ্যৎ যুদ্ধে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যৌথ কার্যক্রম নিশ্চিত করতে ভারতকে সামরিক সমন্বয় ত্বরান্বিত করতে হবে।

২. **প্রতিরক্ষা উৎপাদনে আত্মনির্ভরশীলতা বৃদ্ধি:** বিদেশী নির্ভরশীলতা কমাতে এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন বাড়াতে **স্বদেশী প্রতিরক্ষা উৎপাদন**, ড্রোন, ক্ষেপণাস্ত্র, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) এবং সাইবার সিস্টেমে বিনিয়োগ বাড়ানো অপরিহার্য।

৩. **গোয়েন্দা ও নজরদারি সক্ষমতা বৃদ্ধি:** আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং হাইব্রিড হুমকি রুখতে ভারতকে রিয়েল-টাইম তথ্য সংগ্রহ, **স্যাটেলাইট নজরদারি**, সাইবার মনিটরিং এবং সীমান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

৪. **উন্নত সাইবার এবং হাইব্রিড যুদ্ধের প্রস্তুতি:** একটি আধুনিক নিরাপত্তা কৌশলে সাইবার আক্রমণ, ড্রোন যুদ্ধ এবং শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা উচিত।

৫. **কৌশলগত কূটনীতি এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্বের বিস্তার:** আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদ এবং আঞ্চলিক অস্থিরতার বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন গড়ে তুলতে ভারতকে QUAD, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা আরও গভীর করতে হবে।

৬. **নিয়ন্ত্রিত উত্তেজনার মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্য প্রতিরোধ বজায় রাখা:** সামরিকভাবে সক্রিয় অবস্থান গ্রহণ করলেও, একটি পারমাণবিক অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারতকে পরিমিত প্রতিক্রিয়া এবং **উত্তেজনা ব্যবস্থাপনা** বা নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

উপসংহার

অপারেশন সিন্দুর ভারতের নিরাপত্তা কৌশলে 'প্রতিক্রিয়াশীল সংযম' থেকে 'সক্রিয় প্রতিরোধে'র একটি নির্ণায়ক পরিবর্তনকে চিহ্নিত করে। এর দীর্ঘমেয়াদী সাফল্য নির্ভর করে সামরিক প্রস্তুতি, প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতা, কৌশলগত কূটনীতি এবং একটি জটিল ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশে কার্যকরভাবে উত্তেজনা ব্যবস্থাপনার ওপর।

Q. "Operation Sindoor reflects a paradigm shift in India's national security doctrine from strategic restraint to proactive deterrence." Discuss the strategic significance of this shift. Also examine the challenges associated with India's emerging security doctrine. (15 Marks)

***

Scan to know more about our courses...

IAS 2-Year GS PCM | **IAS 10-Month GS PCM** | **Degree + IAS** | **Prelims Test Series**

Click here to watch this video